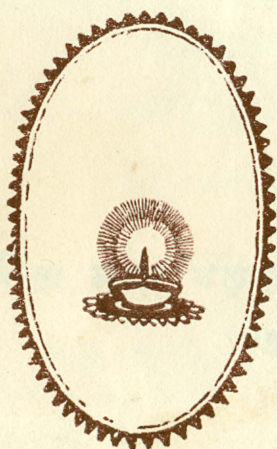


শিক্ষু বুদ্ধদাস বিম্বচিত

# আমিত্তে বিপত্তি



মনীন্দ্র লাল বড়ুয়া

অনুদিত



## কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠান বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং

ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান

ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!  
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by B Jyoti Bhante

সোসাইটি পুস্তিকা-৩৩

ভিক্ষু বুদ্ধদাস বিরচিত  
আমিষে বিপত্তি

মনীন্দ্র লাল বড়ুয়া

অনুবৃত্ত



পালি বুক সোসাইটি  
বাহিনাদেশ


১২, হেমসেন লেইন, চট্টগ্রাম।

সোসাইটি পুস্তিকা—৩৩

Buddhist Missionary Society, Kualampur  
প্রকাশিত “The Danger of I”র বাংলা সংস্করণ  
“আমিহে বিপত্তি”

প্রকাশ কাল : প্রবারণা পূর্ণিমা ১৩৯৩  
( ৩১ শে আশ্বিন '৯৩—২৫৩০ বুদ্ধাব্দ  
১৭ই অক্টোবর, ১৯৮৬ ) ।

প্রাপ্তি স্থান : নালন্দা  
আন্দরকিলা, চট্টগ্রাম ।

৩০  
বিনিময় : 

প্রকাশক : পালি বুক সোসাইটি, বাংলাদেশ  
১২, হেম সেন লেইন, চট্টগ্রাম ।

মুদ্রণে : শান্তি প্রেস,  
চট্টগ্রাম ।

ଓଢ଼ିଆ

ପରମାରାଧ୍ୟ  
ଜ୍ଞାନଗାନ୍ଧୀ ମହାସ୍ଵରାଜ  
ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ମୃତିରେ—

ମନୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ବଡ଼ସା

## কর্মবীর জ্ঞানপাল মহাস্থবির

কর্মবীর জ্ঞানপাল মহাস্থবির ১৯২৪ সনে সাতকানিয়া উপজেলার এক আদর্শ রূপনগর সুইপুরা গ্রামে বৌদ্ধকুলে আবির্ভূত এক সু-সন্তান। এ'মহান পুণ্যপুরুষের পিতার নাম নতুন চন্দ্র বড়ুয়া', আর মাতার নাম প্রফুল্ল বড়ুয়া। মাতা-পিতার একমাত্র ছেলে এ কৃতি পুরুষের হাতে খড়ি গ্রাম্য পাঠশালায়। শিক্ষা জীবনের বিকাশ লাভ হয় সাতবাড়িয়া শান্তি বিহার ও রত্নাকুর বিহারে। পরবর্তীতে ১৯৩৭ সনে বাংলাদেশের 'সংঘরাজ নিকায়' ভুক্ত মহান পঞ্চম সংঘরাজ তেজোবন্ত মহাস্থবির মহোদয়ের পৌরহিত্যে 'জ্ঞানপাল' নাম ধারণ করে—ত্রয়োদশ বর্ষে পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে প্রামাণ্যধর্মে দীক্ষালাভ করেন। অতঃপর ১৯৪৪ সনে অন্তুদ কর্মশক্তি সম্পন্ন এ শ্রমণ মহান সপ্তম সংঘরাজ অভয়তিত্ত মহাস্থবির মহোদয়ের পৌরহিত্যে শংখ নদীর উদক সীমায় উপসম্পদা গ্রহণ করেন। এ বুদ্ধপুত্র শুধু আনুষ্ঠানিক উপাসনা বা প্রার্থনায় নিবদ্ধ না থেকে এবং কর্মহীন বিশ্বাস, জড়তা বা শ্রমবিমুখতার প্রশ্রয় না দিয়ে শীল ও বিনয়সম্পন্ন জীবনযাপনের মাধ্যমে তথাগত বুদ্ধের মৌলিক দর্শন 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়' — পথে ব্রতী হয়ে বিগত প্রায় তিন দশক যাবৎ বাঁশখালী উপজেলার প্রথমে জলদী ধর্মরত্ন বিহারের উপাধ্যক্ষ ও পরে শীলকুপ চৈত্যবিহারের বিহারাধ্যক্ষ পদে আসীন থেকে একজন সধর্মপ্রচারক, সমাজ ও সংঘের একনিষ্ঠ সেবক, শিক্ষা ও সংস্কৃতিসেবী ও কর্মবীর 'জ্ঞানপাল মহাস্থবীর' নামে খ্যাতি লাভ করেন। জলদী গ্রামে অবস্থানকালে ১৯৫২ সনে বিনয়ার্চ্য অভয়তিত্ত মহাস্থবিরের উপাধ্যাক্ষত্বে তাঁর প্রিয় ও সুযোগ্য শিষ্য বুদ্ধদত্ত মহাস্থবিরের উপসম্পদা নব-ইংগিত তথা গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করে।

১৯৫৮ সনে তিনি শীলকুপ সাধন কুটীরের অধ্যক্ষপদ অলঙ্কৃত করে ইত্যর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত দীর্ঘ সাতাশ বর্ষাবাস যাপন করেন। পরবর্তীতে এ'সাধন কুটীর'ই 'চৈত্য বিহার' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

১৯৫০ সনে জলদী ধর্মরত্ন বিহারে সংঘনায়ক অভয়তিত্ত মহাস্থবিরের জগৎ-জয়ন্তী উদ্‌যাপন ও সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার সাধারণ অধিবেশন আশ্রান, ১৯৬০ সনে প্রিয়রত্ন মহাস্থবিরের শবদাহক্ৰিয়া অনুষ্ঠানে সম্পাদকের সফল গুরুদায়িত্ব পালন, ১৯৬৩ সনে ধর্মকীর্তি মহাস্থবিরের দাহক্ৰিয়া অনুষ্ঠানে

সভাপতির পদে কর্মদক্ষতার পরিচয়, ১৯৬৮ সনে শীলকুপ জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ, ১৯৮৫ সনে নির্বাণগত অভয়তিথ্য মহা-  
স্ববিজ্ঞের স্মৃতি মন্দির প্রতিষ্ঠা, বাঁশখালী শাসনকল্যাণ ভিক্ষু সমিতির সম্পাদক  
ও বাঁশখালী বৌদ্ধ সমিতির সভাপতি হিসাবে অদক্ষ কার্যপরিচালনা তাঁর  
কর্ম-প্রতিভার সুস্পষ্ট নিদর্শন মেলে।

তাঁর অজেনশীল কর্মের আর একটি বিশিষ্ট দিক হচ্ছে—বাঁশখালী  
অভয়তিথ্য পালি কলেজ, রূপনগর প্রজ্ঞাজ্যোতি পালি কলেজ, মৈতলা  
জ্ঞানপাল পালি কলেজ এবং পুরাণগড় হরকিশোর পালি টোল প্রতিষ্ঠা।

পরলোকগত ‘জ্ঞানভাপস’ বিভূতি ভূষণ ভট্টাচার্যের ভাষায়—চিরায়ত  
কল্যাণের সম্বন্ধাচার্হে জ্ঞানপাল প্রশান্ত জ্ঞানে ও ইচ্ছায় প্রজ্ঞার এক স্বত্বরাজ  
অজু বনস্পতি।

যা হোক গুণময় এ কৃতিপুরুষ আজ আমাদের মাঝে নেই। তিনি  
দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে ভুগতে ভুগতে তৈলহীন প্রদীপ শিখার মতো ক্ষীণ  
প্রাণের আকোঁ আলিয়ে আলিয়ে ১৯৮৬ সনের ১৭ই জুলাই চিরতরে  
নির্বাণিত হন। নির্বাণগামী এ মহাস্ববিজ্ঞের স্মিত্তিক প্রতিকৃতি দেখলেই মানব  
চিত্তের নির্মল মুক্তির শামলতীর চোখের গভীরে জেগে উঠে—

“পূজনীয়গণের পূজা করাই উত্তম মঙ্গল”

—বুদ্ধ বাণী

## ঐ পুস্তিকা প্রসঙ্গে

এ পুস্তিকাখানা মূলতঃ সাবলাইম লাইফ মিশন, ৫ / ১ আটসাদাং রোড, ব্যাংকক ২, থাইল্যান্ড কর্তৃক 'অন্ত রকমের জন্ম' এ শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল।

এ পুস্তিকাখানার গ্রন্থকার শ্রদ্ধেয় ভিক্টর বুদ্ধদাস হচ্ছেন থাইল্যান্ডবাসী অশ্রুতম সুবিদিত ভিক্টর। সহজ ও প্রাত্যহিক ভাষার সমন্বয়ে বৌদ্ধধর্মকে সকলের বোধগম্য করে প্রচার করার জন্য এ উদারচিত্ত পণ্ডিত ভিক্টর সর্বজনবিদিত। তিনি আরো খ্যাত হয়েছেন অগ্ন্যাত্ত ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে অপ্রোজনীয় হনু ও দুর্বোধ্যতা পরিহার করে বৌদ্ধদের মতাদর্শ উপহার দিয়ে।

আমরা গ্রন্থকার ও প্রকাশকের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। উভয়েই আমাদেরকে এ পুস্তিকাখানা 'দি ডেঞ্জার অব আই' এ শিরোনামে পুনঃমুদ্রণ করার অনুমতি প্রদান করেছেন।

আমরা আন্তরিকভাবে আশা রাখি এ মূল্যবান পুস্তিকাখানা বৌদ্ধধর্মের জুগভীর তথ্য আবশ্যকীয় অংশ অহমিকা'র মায়া ও ধারণা সম্পর্কে জনসাধারণের উপর রেখাপাত করবে।

বুদ্ধ মতবাদ অনুসারে এ পৃথিবীতে মানব চিন্তের শক্তিশালী অহমিকাই যত দুঃখ দুর্দশা, হতাশা ও বিপত্তির প্রধান কারণ। যতক্ষণ পর্যন্ত এ মানসিক প্রতিবিম্ব 'অহমিকাবোধের' উচ্ছেদ সম্ভবপর নহে, ততক্ষণ মানুষের পক্ষে বাস্তব শান্তি ও সুখ লাভ করা কঠিন। 'আমি' এবং 'আমার' ধারণাবিহীন জীবনই সম্পূর্ণ ও পরিতৃপ্ত জীবন।

কুলালামপুর, মালয়েশিয়া।

কে, শ্রী ধর্ম্মানন্দ

০০ / ১ / ১৯৭৪ ইং

বাঁশখালী জলদী গ্রাম নিবাসী শ্রী মনীন্দ্র লাল বড়ুয়া পুস্তিকাটির বাংলা সংস্করণ প্রকাশে সহযোগীতা করার আমরা তাঁর কাছে ঋণী। অনুবাদকের শ্রম সার্থক হবে পাঠক পুস্তিকার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় অনুধাবন করে জীবন চর্চা করলে।

শুভ প্রবারণা তিথিতে সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

চট্টগ্রাম,

শ্রী চারু বাল্য বড়ুয়া

০০-৮-১০২০।



## আমিছে বিপত্তি

যে বিষয়টো আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি, আমি বোধ করি তা সকলেরই অত্যন্ত জরুরী মনে করা উচিত। বিশেষতঃ এ সম্পর্কে বুদ্ধের দু'টি বাণী হচ্ছে—

- (১) জন্ম নিয়তই দুঃখ (দুঃখা জাতি পুনপ্পুনম) এবং
- (২) মিথ্যে ধারণা প্রসূত অহমিকা পরিত্যাগের মাঝে পরম সুখ (অসম্মিনসস বিনয় এতম বে পরমম সুখম)।

মানবজাতির সমস্তা সমূহ হয় বাহিরের অশ্রু কেহ বা অশ্রু কিছু নতুবা, নিজে আত্মক্ৰেশ দ্বারা আরোপিত হয়ে দুঃখ সমস্তায় পর্যবসিত হয়েছে। কেহ দুঃখকে কামনা করে না বলে এটা হচ্ছে প্রতিটি মানুষের প্রাথমিক সমস্তা। উপরোক্ত দুটো বাণীতে বুদ্ধ দুঃখকে 'জন্মগ্রহণ' করার কারণ বলে প্রতীয়মান করেন। অর্থাৎ জন্ম নিয়তই দুঃখ; এবং তিনি সুখকে মিথ্যে ধারণাপ্রসূত অহমিকা'র বিলোপসাধন বলে প্রতীয়মান করেন।

জন্মগ্রহণ করাই যেহেতু দুঃখের কারণ— সেহেতু 'জন্ম' শব্দটি ব্যাখ্যা করা প্রধান অস্ববিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের মাঝে অনেকেই 'জন্ম' শব্দটা কি উল্লেখ করে তা বুঝি না বরং 'জন্ম' বলতে স্বাতন্ত্র্য থেকে সরাসরি সশরীরে ভূমিষ্ট হওয়া মনে করি। বুদ্ধ বলেছেন— জন্ম নিয়তই দুঃখ। ইহা মনে করা স্বাভাবিক যে, তিনি কি তা'হলে শারীরিক জন্মের কথাই বলেছেন? ভেবে দেখলে বুঝা যায় যদি তিনি শারীরিক জন্মের কথা বলতেন তবে তিনি মিথ্যে ধারণা প্রসূত অহমিকা পরিত্যাগের মাঝে পরম সুখ এ'কথা বলতেন না। এ'বাণী পরিস্কার রূপে নির্দেশ করে যে, দুঃখ সমূহের কারণ মিথ্যে ধারণা প্রসূত অহমিকা থেকে। এই মিথ্যে ধারণা অহমিকা'র মূলোৎপাটনের মধ্য দিয়ে লাভ করা যায় পরম সুখ। তাই দুঃখ প্রকৃতপক্ষে মিথ্যে ধারণা প্রসূত আমি; 'আমি হই' 'আমার আছে' এরই মধ্যে নিহিত। বুদ্ধ বলেছেন— 'জন্ম নিয়তই দুঃখ'। এখানে 'জন্ম' শব্দটা কি বুঝাচ্ছে? তা'হলে পরিস্কাররূপে আমরা বলতে পারি 'জন্ম' অহমিকাবোধের উৎপত্তি ছাড়া আর কিছুই না। যেমন সাধারণতঃ মনে করা হয় এ 'জন্ম' শারীরিক জন্ম বা ভূমিষ্ট হওয়া নয়। জন্মকে শারীরিক জন্ম হিসেবে মনে করার মত ভুল অনুমান বুদ্ধ শিক্ষানীতি উপলব্ধি করার এক মহা প্রতিবন্ধক।

## প্রাত্যহিক ভাষা ও ধর্মভাষা

মূলগ্রন্থ অনুযায়ী এটুকু মনে রাখতে হবে যে একটি শব্দ সাধারণতঃ বিভিন্ন রকম অর্থবহন করতে থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে দু'টি প্রধান কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে:— (১) শারীরিক বস্তু উল্লেখিত ভাষা, যা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং (২) মানসিক বস্তু সম্বন্ধিত ভাষা, যা মনস্তাত্ত্বিক ধর্মভাষা, যা কেবলমাত্র ধর্মজ্ঞানী লোকেরাই ব্যবহার করে থাকেন। প্রথমটি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে বলে উহা প্রাত্যহিক ভাষা এবং দ্বিতীয়টি শুধু ধর্মজ্ঞানী লোক কর্তৃক ব্যবহৃত হয়ে থাকে বলে উহা ধর্মভাষা।

একজন সাধারণ লোক কথা বলার শিখেছে বলেই কথা বলেন। আর তিনি জন্ম শব্দটাকে শুধুমাত্র মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার মত শারীরিক জন্মই মনে করে থাকেন। পক্ষান্তরে ধর্মজ্ঞানী ব্যক্তি 'জন্ম' শব্দটাকে 'আমি হই'—এ ধারণাপ্রসূত বলে মনে করে থাকেন। যদি কোন মুহূর্তে 'আমি হই' এ মিথ্যে ধারণাটা চিন্তে উৎপন্ন হয়, তখন সেই মুহূর্তে অহমিকার উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করতে হবে। আর যদি এ মিথ্যে ধারণার অবসান ঘটে তখন অহমিকারও বিলয় ঘটে। এখানে অহমিকার ক্ষণিকের জন্ম অস্তিত্ব বিলোপ ঘটেছে। পুনরায় যদি চিন্তে অহমিকার উৎপত্তি হয় তখন ধরে নিতে হবে সেই অহমিকার পুনর্জন্ম ঘটল। এটাই ধর্মভাষায় জন্মের অর্থ। ইহা রক্তমাংস বিশিষ্ট জননীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হওয়া শারীরিক জন্ম নয় কিন্তু তৃষ্ণা, অবিষ্টা, উপাদান বিশিষ্ট মানসিক জননী থেকে ভূমিষ্ট হওয়া মানসিক জন্ম। যে কোন প্রকারেই অহমিকার জন্ম হলে অর্থাৎ সেই মিথ্যে ধারণা প্রকৃত অহমিকার উৎপত্তি ঘটলে আপনি তৃষ্ণাকে জননী এবং অবিদ্যাকে জন্মদাতা জ্ঞান করতে পারেন। মোহই অবিষ্টা এবং তৃষ্ণা বা উপাদান—যা অহমিকার জন্মদাতা ও জননী। অবিদ্যা, মোহ, দুর্বোধাতা যে "আমি", "আমাকে" বিপত্তিগত ধারণার জন্ম দেয়—তা নিয়তই দুঃখ। শারীরিক জন্ম কোন সমস্যা নয়; মাতৃজঠর থেকে একবার ভূমিষ্ট হয়ে সেলেই জন্মের সাথে মানুষের আর কিছু থাকে না। মাতৃজঠর থেকে ভূমিষ্ট হতে সময় লগে মাত্র কয়েক মিনিট এবং কাউকে কখনো এ অভিজ্ঞতা একবারের অধিক অর্জন করতে হয় না।

আমরা বারবার জন্মগ্রহণ করার কথা আর্থাৎ পুনর্জন্মের কথা শুনে থাকি যাতে অনিবার্য দুঃখের কারণ ঘটে। আসলে এ পুনর্জন্ম কি? এ পুনর্জন্মের কারণই বা কি? জন্ম যা উল্লেখিত হয়েছে তা একটা মানসিক ঘটনা, যা মানসিক স্তরে আমাদের মুখোশের অন্তরালের একটা অশারীরিক দিক।

ধর্মভাষায় এটাই জন্ম। প্রাত্যহিক ভাষায় জন্ম হচ্ছে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া। ধর্মভাষায় জন্মের কারণ হচ্ছে আবিদ্যা তৃষ্ণা এবং উপাদান যা ‘আমি’ ‘আমার’ দ্রাস্তা ধারণার উৎপত্তি থেকে। এই ‘জন্ম’ শব্দের দু’টি অর্থ।

এই প্রয়োজনীয় বিষয়টা অবশ্যই বুঝে নিতে হবে। যদি কেহ তা ঝাঁকড়ে ধরতে অক্ষম হন তাহলে তিনি বুদ্ধ শিক্ষানীতির কোনটাই বুঝে উঠতে পারবেন না। তাই এর প্রতি বিশেষ কোতূহল থাকা চাই। দু’প্রকারের ভাষার মধ্যে দু’স্তরের অর্থ বিরাজমান। যেমন:—শারীরিক বস্তু উল্লেখিত প্রাত্যহিক ভাষা এবং মানসিক বস্তু উল্লেখিত ধর্মভাষা যা ধর্মজ্ঞানী ব্যক্তিরাই ব্যবহার করে থাকেন। এ বিষয়টা ব্যাখ্যা করে দেখাতে কতিপয় দৃষ্টান্তের প্রয়োজন।

‘পথ’ শব্দটা নিয়ে বিবেচনা করা যাক। সাধারণতঃ আমরা পথ বলতে যার উপর দিয়ে যান-বাহন, লোকজন, প্রাণী চলাফেরা করতে পারে এমন একটা পথ উল্লেখ করে থাকি। কিন্তু বুদ্ধ নির্দেশিত সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, ‘সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধিই পথ—যা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ও মাধ্যমথ অনুশীলনের মাধ্যমে নির্বাণগামী করে। প্রাত্যহিক ভাষায় ‘পথ’ শারীরিক—যার উপর দিয়ে চলাচল করে যানবাহন ও যাত্রী। ধর্মভাষায় ‘পথ’ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের সঠিক অনুশীলন বুঝায়। এই হচ্ছে ‘পথ’ শব্দের দুই ভিন্ন অর্থ।

তদুপ ‘নির্বাণ’ শব্দটও দুই ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। প্রাত্যহিক ভাষায় ইহা একটা তপ্ত বস্তুকে শীতল করা বুঝায়। উদাহরণ স্বরূপ, যেকোন তপ্ত কয়লা শীতল হয়, যেকোন পান্থস্থিত তপ্ত খাবার শীতল হয়

এ অবস্থাকে নির্বাণের সাথে তুলনা করা হয়। এই গেল প্রাত্যহিক ভাষা। ধর্মভাষায় ‘নির্বাণ’ মানসিক অশুচি অপসারণের ফলে শীতল অবস্থাকে বুঝায়। যে মুহূর্তেই মানসিক অশুচি থেকে মুক্তিলাভ করা যায় সে মুহূর্তেই ক্ষণিক নির্বাণ, শীতলা লাভ করা সম্ভব। সুতরাং প্রাত্যহিক ভাষা ও ধর্মভাষায় নির্বাণ ও শীতলতার দুই ভিন্ন অর্থ রয়েছে।

অন্য এক প্রয়োজনীয় শব্দ হচ্ছে শূণ্যতা। প্রাত্যহিক ভাষায় কোন বস্তুর সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিকে বুঝায় শূণ্যতা। ধর্ম ভাষায় এর অর্থ ‘আমি’ ‘আমার’ বিপত্তিগত ধারণার অনুপস্থিতি বুঝায়। মন যখন ‘আমি’ ‘আমার’ বিপত্তির কোনটাতেই আঁকড়ে থাকে না তখন এ অবস্থাকে ‘শূণ্যতা’ বলা হয়। ‘শূণ্যতা’ শব্দের এ দু’ধরনের অর্থের এক হচ্ছে শারীরিক বস্তু উল্লেখিত প্রাত্যহিক ভাষা এবং অপরটি হচ্ছে মানসিক বস্তু উল্লেখিত ধর্ম ভাষা। শারীরিক শূণ্যতা কোন বস্তুর অনুপস্থিতিকে বুঝায়। মানসিক শূণ্যতা বলতে শারীরিক জগতের সকল বস্তুর উপস্থিতিতে বুঝায় কিন্তু তাদের মধ্যে কোনটি ‘আমার’ এ বোধের সাথে সম্পৃক্ত নহে। এ ধরনের চিন্তকে ‘শূণ্য’ বলা যেতে পারে। যখন মনের কাছে কোন বস্তু আকর্ষিত, ধারণযোগ্য আকর্ষণযোগ্য এবং অনুসরণযোগ্য হিসেবে গণ্য হয় না এমন মনকে তখনই আকাঙ্ক্ষারহিত, ধারণ অযোগ্য, আকর্ষণ অযোগ্য এবং অনুসরণ অযোগ্য বলে গণ্য করা হয়। সেই অবস্থায় সকল বস্তুই স্থিতিশীল এবং চিন্তার কার্য ও প্রক্রিয়া স্থিতিশীল। কিন্তু কোন অবস্থাতেই বস্তুসমূহ ‘আমি’ এবং ‘আমার’ বিপত্তিসমূহের দ্বারা আসক্তিপন্ন নয়। শূণ্য চিন্তা বলতে আকর্ষণরহিত, অনুসরণরহিত চিন্তাকে বুঝায়। মূলতঃ রাগ, দ্বेष ও মোহ-শূণ্য চিন্তাকে শূণ্য বলে গণ্য করা হয়েছে। বিখ্যেও শূণ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ ইহা ‘আমি’ বা, ‘আমার’ বিপত্তি শূণ্য। ধর্ম ভাষায় ‘শূণ্য’ কে শারীরিক শূণ্য বুঝায় না।

আমরা সচরাচর প্রাত্যহিক অনুভূতি দ্বারা আমাদের সম্মুখে উদ্ভিত ঝঙ্কাট ও দুর্বোধ্যতা উপলব্ধি করে থাকি। ধর্মভাষা বুঝতে না পারলে আমরা কখনো ধর্মকে বুঝতে পারব না এবং অবগত হব না ধর্মভাষায় সব-চেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ ‘জন্ম’ শব্দের সংজ্ঞা।

## আমিহের মায়া

যে ‘জন্ম’ আমাদের সমস্তা স্থাপন করে উহাই মিথ্যে ধারণা প্রসূত অহমিকা—মানসিক জন্ম। যেই অহমিকার উৎপত্তি সেই মানুষ ‘আমি এ রকম’ ধারণার বশবর্তী হয়। উদাহরণ স্বরূপ—আমি একজন লোক, আমি একটা জীবন্ত আমি একজন ভাল লোক পক্ষান্তরে আমি ভাল নই অথবা এ ধরনের অশু কিছু। একদা উখিত ‘আমি এই রকম’ ধারণাটা তখন আমি অমুক থেকে ভাল, আমি অমুকের মত ভাল নই। আমি অমুকের সমান তুলনামূলক ধারণায় রূপান্তরিত হয়। এইসব ধারণা ‘আমি হই’। ‘আমি বেঁচে আছি’ এ সব মিথ্যে ধারণার অন্তর্ভুক্ত এবং ইহা থেকে ‘জন্ম’ সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়।

তাই আমরা এক দিনে অনেক বার এবং কয়েক সহস্রবার জন্ম গ্রহণ করে থাকি। এমন কি একটা ক্ষুদ্র মুহূর্তে আমরা অসংখ্যবার জন্মগ্রহণ করি। যখনই চিন্তে ‘আমি’ এবং ‘আমি এ রকম’ ধারণার উৎপত্তি হয় তখনই ইহাকে ‘জন্ম’ বলা হয়। আর যদি চিন্তে এ ধরনের কোন ধারণার উৎপত্তি না ঘটে তবে ধরে নিতে হবে সেখানে কোন জন্ম নেই এবং এ জন্ম মুক্তিই শান্ত-শীতলতা। তাই এ নীতিকে চিনে রাখতে হবে যে যখনই ‘আমি’ ‘আমার’ এ সমূহের উৎপত্তি ঘটে তখনই চিন্তে সংসারচক্রের জন্ম বিগ্রহ ঘটে—আর যেখানে দুঃখ ও জ্বালায় আবর্ত। আবার যেখানে এ ধরনের ক্রটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্তি সেখানে জন্ম বিগ্রহের পশ্চিমবর্তে নির্বান। (নির্বানকে তদঙ্গ-নিক্বান বা ভিক্ষুস্তানা নির্বান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে)

তদঙ্গ-নিক্বান অঙ্গুস্তর নিকায়ের বর্ণনা করা হয়েছে। তদঙ্গ-নিক্বান হচ্ছে ‘আমি’ ও ‘আমার’ বিপত্তির ক্ষণিক নিরত্তি।

এর চেয়ে উচ্চতর স্তরে যদি আমরা ধর্ম চর্চায় আত্মনিয়োগ করি, বিশেষতঃ আমরা ভাবনা বা সমাধির এভাবে উন্নতি সাধন করতে পারি যাতে ‘আমি’ ‘আমার’ বিপত্তির উৎপত্তি না ঘটে তখন সেই অবস্থায় আমি, আমার বিপত্তির বিলোপ সাধনকে বলা হয় ভিক্ষুস্তানা-নিক্বানা। এবং পরিশেষে যখন আমরা সমুদয় অকৃতির বিলোপসাধন ঘটাতে সমর্থ হই—ইহাই পরিপূর্ণ বা সমষ্টি নির্বান।

চলুন আমরা পৃথগজনদের প্রাত্যহিক জীবন সম্পর্কিত আলোচনা সীমিত করি। ইহা অবশ্যই বুঝতে হবে যে, যেখানে ‘আমি’, ‘আমার’ এ ধারণা সমূহের অস্তিত্ব থাকে সেখানে জন্ম, দুঃখ, সংসারচক্র বিস্তৃত থাকে। ‘আমি’ বিপত্তি উৎপন্ন হয়ে ঋনিকক্ষণ স্থায়ী হয়ে তারপর অবসান ঘটল—পুনরায় জন্ম ধারণ করল—ঋনিকক্ষণ স্থায়ী হয়ে আবার অবসান ঘটল—এ পদ্ধতিটাকে যে কারণে সংসার চক্র উল্লেখ করা হয়েছে। ‘আমি’ বিপত্তির জন্মধারণ হেতু ইহা দুঃখের কারণ। যদি কোন মুহূর্তে অনুকূল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ‘আমি’ ধারণার উৎপত্তি না ঘটে তখনই ক্ষণস্থায়ী নির্বাণ তদঙ্গ নির্বাণ, নির্বাণের আশ্রয় গ্রহণ, নির্বাণের নমুনা, শাস্তি—শীতলতা বলা হয়েছে।

অজুস্তরনিকারে নির্বাণ শব্দটা কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা বিবেচনা করলে আমরা তা আরো পরিষ্কাররূপে জানতে পারব। মূল গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই তপ্ত বস্ত্র শীতল হওয়ারূপে নির্বাণ বলা হয়েছে। বস্ত্র প্রাণীকে পুষিয়ে বিনয় এবং শাস্ত করে গড়ে তোলাকে ‘নির্বাণ’,\* বলা হয়েছে থাকে। কিভাবে একজন মানুষ শাস্ত হয়? এ প্রশ্নটা জটিল এ কারণে যে তার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও জীবনবোধ আকস্মিকভাবে অর্জিত হয়নি বরং তার দীর্ঘ জীবনকালের পলে পলে গড়ে ওঠেছে।

বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে মানুষের ধারণা ছিল নির্বাণ ইন্দ্রিয়জাত আনন্দের মধ্যে নিহিত। কারণ, তাদের ধারণা ছিল কোন ব্যক্তি যেই ইন্দ্রিয়জাত আনন্দ কামনাই করুক না কেন তিনি নিশ্চিতরূপে এক ধরনের শীতলতা লাভ করে থাকেন। কোন রৌদ্রতপ্ত দিনে এক পশলা ঝট্টির আমেজ এ ধরনের শীতলতা। আর কোন ঝামেলাহীন নীরব পরিবেশ নিয়ে আসে ভিন্নতর তৃপ্তি। শুরুতে মানুষ ঐন্দ্রিয়িক আনন্দের প্রাচুর্যতায় নির্বাণ নিহিত ছিল বলে মনে করতেন। পরে, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হলেন যে ইন্দ্রিয়জাত আনন্দ তত ভাল নয়। তারা দেখতে পেলেন যে, ইন্দ্রিয়জাত আনন্দ আসলে সীমাহীন মায়া-মরীচিকা সদৃশ। তাই তারা সমাধি বা ভাবনার মানসিক প্রশান্তির মাঝে তাদের শীতলতা

\* এখানে নির্বাণ ব্যবহারিক অর্থে ব্যবহৃত।

খুঁজতে চাইতেন। সমাধি হচ্ছে নিখুঁত মানসিক শীতলতা বা প্রশান্তি যা বুদ্ধের বুদ্ধ লাভের অব্যবহিত পূর্বে সত্যানুসন্ধানী লোকেরা নির্বাণ মনে করতেন।

গুরুরা শিক্ষা দিতেন যে ঐ নির্বাণ মানসিক সমাধির অভিন্ন এক পরিশুদ্ধ অবস্থা। বুদ্ধের সর্বশেষ গুরু উদকতাপস রামপুত্র বুদ্ধকে এই বলে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, সমাধি (ন এব সঞান অসঞাতন) লাভ করতে হলে সম্পূর্ণরূপে দুঃখ নিরোধ জ্ঞান লাভ করা চাই। কিন্তু বুদ্ধ এ শিক্ষাকে সঠিক নির্বাণ জ্ঞান না করাতে ইহা গ্রহণ করলেন না। তিনি অবিচলিত চিন্তে আত্মপথ অনুসরণ করে গভীরভাবে ধ্যানমগ্ন হলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না নির্বাণকে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হলেন যে ইহা তৃষ্ণা ও উপাদানের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন ছাড়া আর কিছুই না। বুদ্ধ লাভ করে তিনি এ শিক্ষা দিয়েছিলেন যে—‘অহমিকা’ বিপত্তি পরিত্যাগের মাঝেই পরম সূত্র। তৃষ্ণা, উপাদান, মোহ ইত্যাদি মানসিক অশুচির বিলোপসাধনই নির্বাণ। এ মানসিক অশুচির সাময়িক অনুপস্থিতিতে সাময়িক নির্বাণ বলা হয়। এভাবে তদঙ্গ নির্বাণ এবং ভিক্ষুজ্ঞান নির্বাণ শিক্ষা আলোচিত হল। মানসিক অশুচি থেকে মুক্ত অবস্থাই তদঙ্গ নির্বাণ বা ভিক্ষুজ্ঞান নির্বাণ।

যদি আমরা একটু ভেবে দেখি আমরা আবিষ্কার করতে সক্ষম হব যে আমরা প্রতিনিয়তই অশুচি কর্তৃক শাসিত নই। তাহলে এমনও অনেক মুহূর্ত কেটে যচ্ছে যখন আমরা থাকি অশুচি মুক্ত। যদি তা সত্য না হতো আমরা অশুচি কর্তৃক তাড়িত হয়ে শীঘ্রই উদ্ভাদ এমন কি মৃত্যুমুখে পর্যবসিত হতাম এবং এভাবে পৃথিবী জনশূন্য হয়ে পড়তো। তাই এ দুঃখ-দুর্দশা সৃষ্টিকারী অশুচির ফাঁকে এহেন স্বরকালীন মুক্তি বাস্তবিকই কল্যাণকর। এভাবে প্রত্যহ আমাদের মানসিক অশুচি থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ অবসর পেয়ে থাকি যার জগৎ প্রকৃতিকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা দরকার। প্রকৃতির অপর এক নিয়মে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি—আর এ ঘুমন্ত অবস্থায় আমাদের চিন্তা থাকে শুচি-শুদ্ধ, শান্ত এবং স্বস্তিদায়ক। যে ব্যক্তি প্রকৃতির এসব নিয়ম-কানুনকে মেনে চলতে পারেন তিনি মনস্তাত্ত্বিক দোর্বল্য ও বিশৃঙ্খলাকে পরিহার করতে পারেন আর যিনি এ নিয়মকে মেনে চলতে পারে না তিনি

মানসিক অস্বস্থতা এমন কি যত্নমুখে পতিত না হওয়া পর্যন্ত অধিক থেকে অধিকতর বিশৃঙ্খলতার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। অবস্থার আনুকূল্যে ক্ষণস্থায়ী নির্বাণের জন্ম আমরা ধরা। এ ক্ষণকাল তৃষ্ণা, আত্মপ্লাঘা এবং বাজে মত বিমুক্ত বিশেষতঃ ‘আমি’ এবং ‘আমার’ এ ধারণা বিমুক্ত, প্রচুর বিশ্রাম বা নিদ্রায় চিত্ত থাকে শূন্য, মুক্ত। তাই চিত্ত হয়ে ওঠে সবল। এ পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানের চেয়ে অতীত দিনগুলো অপেক্ষাকৃত সাধারণ। চিরপরিবর্তনশীল জ্ঞান ও আচরণ সম্পন্ন আধুনিক মানুষ অতীত যুগের মানুষের চেয়ে বেশী মানসিক অশুচি সংক্রান্ত ঝামেলার শিকার। ফলে আধুনিক মানুষ মনস্তাত্ত্বিক অস্বস্থতার বেশী আক্রান্ত? যতবেশী বিজ্ঞান-সম্মত জ্ঞান লাভ করছেন ততবেশী উন্নততা তাদের পেয়ে বসেছে। হাসপাতালে মানসিক ব্যাধিসম্পন্ন রোগীর সংখ্যা এত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, সেখানে তাদের জায়গা সংকুলান হচ্ছে না। এর পেছনে যে সাধারণ একটা কারণ রয়েছে— মানুষ জানেনা তার কিভাবে শিথিলতা সম্পাদন করতে হয়। তারা ভারী উচ্চাকাঙ্ক্ষী। একেবারে ছোটবেলা থেকেই তাদেরকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হবার এ শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। ঠিক বাল্যকালে তারা স্নায়ুবিক অসঙ্গতি অর্জন করে এবং ঐ সময়ে বিদ্যাশিক্ষা সম্পন্ন করে থাকে বলেই তারা মানসিক বিপর্যস্ত লোক। এর কারণ তারা বুদ্ধ নির্দেশিত ‘আমি’ এবং ‘আমার’ বিপত্তির জন্ম ধারণা যে দুঃখের চূড়ান্ত সীমা তা গ্রহণ করে না বলেই।

চলুন এখন আমরা ‘জন্ম বাদ’ ও তার কারণ খুঁজতে যাই। জন্মমুহুর্তে তিনি যেভাবেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন ‘জন্ম’ দুঃখ ছাড়া আর কিছুই না। কারণ, জন্ম বলতে এখানে সতর্কতাহীন আসক্তি উল্লেখ করা হয়েছে। এহেন দরকারী বিষয়টা ভালভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, যখন কোন ব্যক্তির চিন্তে ‘আমি এরকম’ এ ধারণার উৎপত্তি হয় এবং তিনি যদি সতর্ক থাকেন যে তাহার চিন্তে এ ধারণার উৎপত্তি হয়েছে তবে সে উৎপত্তিকে ‘জন্ম’ বলা হয় না [ধর্মভাষা] পক্ষান্তরে তিনি যদি প্রভাবিত হয়ে এ ধারণাকে মনে করে থাকেন তবে উহা ‘জন্ম’। তাই বুদ্ধ অবিরাম সজাগ (স্মৃতি সম্পন্ন) থাকার উপদেশ প্রদান করেছেন।

যদি আমরা জানতে পারি যে, আমরা কি— কি-ই বা করতে হবে আমাদের এবং তা যদি আমরা সাবধানতার সাথে সম্পন্ন করি— সেখানে



কোন দুঃখ থাকতে পারে না। কারণ, সেখানে ‘আমি’ বা ‘আমার’ এ বিপত্তির জন্ম নেই। যখনই মোহ, অসতর্কতা এবং বিস্মৃতিশীলতার উদ্ভব ঘটে তখনই ‘আমি’, ‘আমার’, ‘আমি অমুক’ ‘আমি এরকম’ বিপত্তি-সমূহের কামনা এবং আসক্তির উদয় ঘটে এবং উহাই জন্ম।

## জন্মই দুঃখ

জন্মই দুঃখ ; এবং জন্মের ভিন্নতা নিয়েই দুঃখ নির্ভর করে। জননী হিসেবে জন্মলাভ একজন জননীর কাছে এবং জনক হিসেবে জন্মলাভ একজন জনকের কাছে দুঃখ আনয়ন করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কারও চিন্তে জননী হবার বিভ্রম ধারণা উৎপত্তি লাভ করে এবং এটা, ওটা কামনা জাগে তবে তা জননীর দুঃখ। জনকের বেলায়ও উহা সত্য এবং একই। তিনি যদি জনক হবার ধারণা লাভ করেন, এটা-ওটা কামনা করেন তবে তা জনকের দুঃখ। কিন্তু কোন লোকের যদি এ’ব্যাপারে সাবধানতা থাকে তবে তাতে কোন ঐর্ষ্যচ্যুতি ও বিকৃতকরণ নেই। তিনি পরিকাররূপে জানেন একজন জনক কিংবা একজন জননী হয়ে তাকে কি করতে হবে এবং ‘আমি এই’, ‘আমি উহা’ এ ধারণার প্রতি আকর্ষিত না হয়ে স্থিরচিত্তে উহা সম্পাদন করে থাকেন। এভাবে তিনি দুঃখমুক্ত ; এ অবস্থায় তিনি যথোপযুক্তভাবে তার ছেলে-মেয়ে প্রতিপালন করতে পারেন। জননী হিসেবে ‘জন্মলাভ’ জননীর জন্ম নিয়ে আসে দুঃখ ; জনক হিসেবে ‘জন্ম লাভ’ জনকের জন্ম নিয়ে আসে দুঃখ ; লক্ষপতি হিসেবে জন্ম লাভ নিয়ে আসে লক্ষপতির জন্ম দুঃখ আর ভিক্ষুক হিসেবে ‘জন্ম লাভ’ নিয়ে আসে ভিক্ষুকের জন্ম দুঃখ। এখানে যে অর্থ পরিলক্ষিত হয়েছে, তা নিম্নোক্ত পার্থক্য দ্বারা বিশদ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

প্রথমেই মনে করি, জনৈক লক্ষপতি মোহ, ইচ্ছা, আসক্তি দ্বারা আবিষ্ট হয়ে ধারণা করে বসলেন যে, ‘আমি একজন লক্ষপতি।’ এ ধারণার অর্থই দুঃখ। এ মানসিক অশুচির প্রভাবে ঐ ব্যক্তি যাই বলুক বা করুক না কেন তাই দুঃখ বলে প্রতীয়মান হবে। এমন কি, ঐ ব্যক্তি নিদ্রা যাবার প্রাক্কালে যদি লক্ষপতি হবার ধারণাটা রোমন্থন করেন তবে তার চোখে নিদ্রা না-ও আসতে পারে। তাই লক্ষপতি হয়েও জন্ম লাভ তার কাছে দুঃখ

নিয়ে আসে। আবার, মনে করা যাক্ জনৈক ভিক্ষুক তার দুর্ভাগ্যের কথা, দারিদ্রের কথা, দুঃখ-কষ্টের কথা এবং নানা অসুবিধার কথা স্মৃতিচারণ করেন তা, ঐ ভিক্ষুকের দুঃখ। যদি যে কোন মুহূর্তে এ দু'ব্যক্তির কেহ উক্ত ধারণামুক্ত হতে পারেন, সে মুহূর্তে তিনি দুঃখ মুক্ত হবেন। লক্ষপতি তিনি তার লক্ষপতি হবার ধারণা এবং দুঃখ হতে মুক্তিলাভ করবেন আর ভিক্ষুক তিনি তার ভিক্ষুক হবার ধারণা এবং দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করবেন। আমরা কখনও বা কোন ভিক্ষুককে মনের স্মৃতি গান গাইতে দেখি কারণ, সে মুহূর্তে তিনি যে ভিক্ষুক তা তার জ্ঞান থাকে না এবং থাকে না বলেই তিনি যে ভিক্ষুক কিংবা তার কোন অসুবিধা আছে তা প্রকাশ পায় না। সেই মুহূর্তে তিনি তার ভিক্ষুক ভূলে গিয়ে একজন গায়ক কিংবা একজন সংগীতজ্ঞ হিসেবে জন্ম গ্রহণ করেন।

মনে করা যাক্ একজন দরিদ্র খেয়াপারাপারের মাঝি। তিনি যদি দরিদ্র হওয়ার ধারণার নিম্নর থেকে ক্লাস্তি আর অবসাদ নিয়ে নৌকার দাঁড় টানেন তিনি নরকের মত দুঃখভোগ করবেন। যদি তিনি সেই ধারণা পোষণ করার পরিবর্তে ধারণা করেন যে যা করার তিনি তাই করছেন— ধারণা করেন যে কাজ করা মানুষ মাত্রেই অদৃষ্ট এবং এসব ভেবে স্থিরচিত্ত হয়ে কর্মজিগ্ম্ব থাকেন তিনি ও দাঁড় টানার মাঝে মনের স্মৃতি গান করার আনন্দ অনুভব করবেন।

একরূপ আত্মজিজ্ঞাসার খুব কাছাকাছি গিয়ে সাবধানে পরিকার রূপে ভেবে দেখুন : আসলে 'জন্ম' শব্দটা কিরূপে উল্লেখ করা হয়েছে? যদি কোন মুহূর্তে জনৈক লক্ষপতি একজন লক্ষপতি হিসাবে জন্মগ্রহণ করার ধারণা লাভ করেন তিনি ঐ মুহূর্তে একজন লক্ষপতির দুঃখজ্ঞান লাভ করে থাকেন। তদ্রূপ যদি জনৈক ভিক্ষুক একজন ভিক্ষুক হিসেবে জন্মগ্রহণ করার ধারণা লাভ করেন ঐ মুহূর্তে তিনিও একজন ভিক্ষুকের দুঃখজ্ঞান লাভ করে থাকেন।

একজন ব্যক্তি তিনি লক্ষপতি হউন, ভিক্ষুক হউন, কিংবা একজন মাঝি হউন বা যাই হউক না কেন তিনি যদি স্ব স্ব পর্যায়ে জন্মগ্রহণ করার ধারণা লাভ না করে থাকেন তিনি দুঃখ মুক্ত। ইদানিং আমরা এ বিষয়ে আদৌ কৌতুহলোদ্দীপক নই। আমরা লাগামহীনভাবে নিজেদেরকে মোহ, হুসা ও আসক্তি দ্বারা পরিচালিত হতে দিচ্ছি।

আমরা উপলব্ধি করতে পারছি না এভাবে, ঐভাবে ও অশ্রুভাবে প্রত্যহ আমরা কত সহস্রবার ‘জন্ম’ অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকি। বুদ্ধ বলেছেন : কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া প্রত্যেক রকমের জন্মই দুঃখ। এ দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করার পথই হচ্ছে জন্ম থেকে মুক্তিলাভ করা। তাই আপনাকে সতর্ক হতে হবে যে যাতে চিন্তা কখনো আমি, আমার বিপত্তি দ্বারা বিশৃঙ্খলিত না হয়। আপনি তখনই দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করবেন। আপনি কৃষক হন, বণিক হন, সৈনিক হন, চাকর হন—যাই হন কিংবা হন আপনি স্বর্গীয় দেবতা—আপনি দুঃখ হতে মুক্তি পাবেনই।

‘আমি’ বিপত্তি ধারণার উৎপত্তি ঘটে তাতেই দুঃখ। এ প্রয়োজনীয় নীতি অনুসরণ করলে আপনি বৌদ্ধ ধর্মের অত্যাশ্চর্য্য সারগর্ভ বুঝতে ও লাভ করতে পারবেন এবং জন্মান্তর বৌদ্ধকূলে মানব হিসেবে জন্মগ্রহণ করার মহাসৌভাগ্য অর্জন করবেন। পক্ষান্তরে আপনি প্রয়োজনীয় নীতি অনুসরণ না করলে আপনি বৌদ্ধকূলে মানব হিসেবে জন্মগ্রহণ করেও কোন সৌভাগ্য অর্জন করতে পারবেন না। আপনি নামমাত্র বৌদ্ধ হবেন ঠিকই কিন্তু আপনাকে অবোধদের মত বসে ফোঁপিয়ে ফোঁপিয়ে কাঁদতে হবে আর সীমাহীন দুঃখসাগর পাড়ি দিতে হবে। একজন খাঁটি বৌদ্ধ হতে হলে আপনাকে বুদ্ধের সঠিক শিক্ষা অনুশীলন করতে হবে এবং বিশেষতঃ ‘আমি’ বা, ‘আমার’ বিপত্তিকে চিহ্নিত করে; বিশেষ সতর্কতার সাথে কর্ম করে এবং তাতেই দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটবে—এ নির্দেশ মেনে চলতে হবে।

আপনি তারপর আপনার কর্ম স্মারকরূপে সম্পন্ন করতে পারবেন—যা হবে আনন্দদায়ক। যেই চিন্তা ‘আমি’ বা, ‘আমার’ বিপত্তির সাথে সম্পৃক্ত হলো সেই সমস্ত কর্ম দুঃখে পর্যবসিত হল; সকল দিকে হালকা কাজ ভারী বোঝার পরিণত হল।

কিন্তু যদি চিন্তা ‘আমি’ বা ‘আমার’ বিপত্তি ধারণা অনুসরণ না করে; যদি ইহা সতর্ক থাকে তবে ভারী কিংবা নোংরা সমস্ত কর্মই উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

এহেন অগভীর গোপন সত্য উপলব্ধি করতে হবে। ‘জন্ম’ নামক এ ক্ষুদ্র শব্দের মাঝে এর সত্য বিস্তারিত। জন্মই দুঃখ।

একবার জন্মকে রোধ করতে পারলে আপনি দুঃখ মুক্ত হবেন। যদি কোন লোক দৈনিক উজ্জ্বল খানেক 'জন্ম' জ্ঞান লাভ করেন তাকে দৈনিক উজ্জ্বলখানেক বার দুঃখ ভোগ করতে হবে ; যদি তিনি তা আদৌ লাভ না করেন-তাকে আদৌ দুঃখ ভোগ করতে হবে না।

বুদ্ধ শিক্ষানীতির গভীর সত্য—ধর্মের পুতাক্ষ অনুশীলনের ফল সূক্ষ্মদর্শী চিন্তদর্পনে এভাবে নিহিত থাকবে যে ইহা সংসারচক্রে আরোহনের পরিবর্তে সর্বদা নির্বানগামী হয়।

আপনাকে প্রহরীবাৎ চিন্তকে এমনভাবে পাহারা দিতে হবে যে যাতে ইহা অবিরাম শাস্ত অবস্থায় থাকে এবং সংসারচক্রে আরোহনের কোন সুযোগ সৃষ্টি না করে।

চিন্ত তখন প্রতিনিয়তই নির্বাণ সামীপ্যে অভ্যস্ত হয়ে যাবে এবং সেই অবস্থায় স্থায়ী ও সম্পূর্ণতা লাভ করবে।

অনুকূল অবস্থার ফলে যে নির্বাণের আগমন ঘটে-যা একটুকু নমুনা মাত্র আমরা ইতিমধ্যে সেই ক্ষণস্থায়ী নির্বাণ লাভ করেছি।

আপনি ইহাকে সহজে সংরক্ষণ করুন। 'আমি' 'আমার' বিপত্তিমূলক ধারণা করে সংসারচক্রের দ্বার উন্মোচন করবেন না। 'আমি' বিপত্তি ধারণাটাকে জন্ম গ্রহণ করার সুযোগ দিবেন না। লক্ষ্য রাখুন, সতর্ক হউন আর পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির উন্নতিসাধন করুন। আপনি দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, মিনিটের পর মিনিট যাই করুন না কেন তা সতর্কতার সাথে করুন।

'আমি' এবং 'আমার' বিপত্তিতে নিজেকে না জড়ালে সংসারচক্রে আবর্তিত হবার সুযোগ পাবেনা নির্বাণ পথে অভ্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত চিন্ত নির্বাণের মধ্যে থাকবে এবং ইহা আর পূর্বাভাস ফিরে আসতে পারেনা ইহাকে পরিপূর্ণ নির্বাণ বলা হয়।

আমার ছেলেবেলা থেকেই 'আমি' এবং 'আমার' বিপত্তিমূলক জন্মের অনুকূল পরিবেশে বাস করে আসছি এবং এভাবে সংসারচক্রে অভ্যস্ত হয়েছি। এ অভ্যাস বর্জন করা কঠিন। ইহা আমাদের জীবনগঠনের অংশ হয়ে আছে। তাই ইহাকে পদশৃঙ্খল বা সুপ্ত মেজাজ বলা হয়ে থাকে যার অনেকটা আমাদের চরিত্রের সাথে সম্পৃক্ত। এ পদশৃঙ্খল বা

সুপ্ত মেজাজকে ‘আমি’ ‘আমার’ জ্ঞান উৎপন্নকারী ‘আমি’ ‘আমার’ জ্ঞান বিপত্তি ও অভ্যাসকে উল্লেখ করা হয়েছে।

এক পর্যায়ে ইহাকে ‘লোভ’ বলা হয় ; অন্য পর্যায়ে ইহাকে বলা হয় ‘রাগ’ দোষ এবং অপর এক পর্যায়ে ইহাকে ‘মোহ’ বলা হয়েছে। ইহা যেকোনো ধারণা করুক না কেন ইহা সাধারণতঃ ‘আমি’ আত্মকেন্দ্রিক বিপত্তি ধারণা ছাড়া আর কিছুই না। যখনই ‘আমি’ কিছু পেতে চায় তখনই উৎপন্ন হয় লোভ ; আর যখন ইহা ঐ ইচ্ছিত বস্তু না পায় তখন উৎপন্ন হয় ‘রাগ’ যখন ইহা ইচ্ছিত করে এবং জানেনা ইহা কি চায় তখন সৃষ্টি হয় সন্দেহতা, আশা ও সম্ভাবনার মাঝে।

লোভ, রাগ ও মোহ যাই হউক না কেন এরা ‘আমি’ বিপত্তি ধারণার রূপ এবং যখনই এরা চিন্তে উপস্থিত হয় তখনই পরিপূর্ণ নির্বাণহীন চিরস্থায়ী সংসারচক্র আবর্তিত হয়। জনৈক ব্যক্তি এ অবস্থার দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারেন না। কিন্তু প্রকৃতি তাকে সাহায্য করে।

## সংজীবন অনুশীলন করুন

যে সমস্ত অর্হৎ পৃথিবীতে ররেছেন তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, আর্থ অষ্টাঙ্গিক মার্গ আচরণই নির্বাণ লাভের পথকে স্বরাস্থিত করার সহজ উপায়। ইহা অনুশীলন করলে নির্বাণ লাভের পথ হয় স্বরাস্থিত আর যতদূর সম্ভব ‘আমি’ ‘আমার’ বিপত্তির উৎপত্তি রোধকরে দুঃখ বা সংসার চক্র হয়ে আসে ক্ষীণতর। ইহা অতি সাধারণ বলে বিশ্বাস স্থাপন করা কঠিন হয়ে পড়ে। বুদ্ধ মতে—যদি ভিক্ষুরা সংজীবন অবলম্বন করেন তবে পৃথিবী অর্হৎশুণ্য হতে পারেনা (সচে মে ভিক্ষু সন্ন্য বিহারেয়্যাম অসুখো লোক অরহতেহি অসুস)। আপনার বিশ্বাস করাটা কঠিন হবে। কিন্তু যদি আপনি ইহা পরীক্ষা করে দেখুন তবে আপনি বিশ্বাস না করে পারবেন না।

সহজ ভাষায় “যদি ভিক্ষুরা সংজীবন অবলম্বন করেন তবে পৃথিবী অর্হৎশুণ্য হতে পারে না।” এ সংজীবন শব্দের গুরুত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্মভীর অর্থ রয়েছে।

সংজীবন 'আমি' 'আমার' বিপত্তি ধারণার অনুপস্থিতি বুঝায়। আমরা দিনের পর দিন বেঁচে আছি অথচ আমরা সৎভাবে জীবন-যাপন করি না। তাই 'আমি' 'আমার' বিপত্তি ধারণার উৎপত্তি ঘটে। এতে প্রত্যহ অজস্র মুহূর্তের ধ্বনি গুঞ্জরিত হয়। তাই এখানে নেই যেমন সম্পূর্ণ নির্বাণের স্নগম পথ তেমনি নেই অর্হৎফলে প্রতিষ্ঠিত হবার কোন স্বেযোগ।

সংজীবন অর্থ আর্থ অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসারে জীবন-যাপন করা। আমরা যদি এ আট প্রকার পূর্ণতা বা পরাকাষ্ঠা লাভ করতে পারি তবে আমরা সংজীবন লাভ করতে পারব। যদি আমরা এ পথে সঠিকভাবে চলি তবে আমাদের মানসিক অশুচি উৎপত্তি লাভ করতে পারে না এবং তা পারেনা বলেই 'আমি', 'আমার' বিপত্তি জন্মধারণ করতে পারে না; এবং তা পুষ্টিহীনতার কারণে কোন প্রাণীর বিশুদ্ধতা দেখা দেবার মতই হয়। সংজীবন 'আমি' 'আমার' বিপত্তির অংকুরবিনাশী এবং এক্ষেপে ইহা বিপত্তি-সমূহের জন্ম নিরোধ করে। যথাসময়ে বিপত্তিসমূহ তাদের অংকুরোদগম শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং পরিশেষে একদিন তা সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে গিয়ে চিরন্তনে অদৃশ্য হয়ে যায়— এবং তখন সেই পর্যায়কে ফলপথ পরিপূর্ণ নির্বাণ বলা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কেবলই সম্যকদৃষ্টি, সম্যককর্ম পরায়ন হওয়া যাতে 'আমি' 'আমার' বিপত্তির উৎপত্তি না ঘটে। এর উৎপত্তি না ঘটলে জন্ম নিরোধ হবে। স্বয়ং বুদ্ধ বলেছেন, যেখানে কোনরকম জন্ম নেই সেখানে কোন রকমের দুঃখ নেই—এবং দুঃখ নেই বলেই রয়েছে বাস্তব সূখ।

একদা জৈনিক ব্যক্তি এ বিষয়টা পরীক্ষা করে দেখতে পান যে জন্ম নিরতই দুঃখ। এ রকম সংবেদনশীল লোক প্রতিনিয়তই জন্ম পরিহার করার জগ্ন সচেষ্ট থাকেন। ইহা সহজবোধ্য যে উল্লেখিত জন্মের কারণ মন ও মানসিকতা। কিন্তু মন ও মানসিকতাকে বশে আনা কঠিন। ২৪ ঘণ্টার অথবা প্রতি ঘণ্টার মানুষ অজস্রবার কিংবা সহস্রবার এ রকম জন্মের অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকেন। এ ধরনের জন্ম সমস্তা থেকে সতর্ক থাকুন। ইহা এমন একটা সমস্তা যা যা কাছে তৎক্ষণাৎ আপনাকে মুখোমুখি হতে হবে। যদি আমরা এহেন মানসিক জন্মকে বশে আনতে পারি তবে আমরা শারীরিক স্বত্বার পর পুনর্জন্মকে বশে আনতে

সক্ষম হব। তাই আমাদের শারীরিক স্বত্বার পর পুনর্জন্মের কথা না ভেবে শারীরিক স্বত্বার পূর্বেকার মন ও মানসিকতার বিষয় ভাবতে হবে। মানুষ মন ও মানসিকতা থেকে জীবিত অবস্থায় দৈনিক সহস্রবার জন্মের আশ্বাদ লাভ করে থাকে। চলুন আমরা এ ধরনের জন্মকে বশে আনতে শিক্ষা গ্রহণ করি এবং তখনই আমাদের সমস্তা দূরীভূত হবে। যদি এ জীবনে জন্মকে একবার দূরীভূত করা যায় তবে চিরতরে জন্মের অবসান ঘটবে।

## আট প্রকার লোক

প্রত্যেকের মনে একটা ক্ষুদ্র প্রশ্ন জাগে স্বত্বার পর তিনি অষ্টম লোকের কোন্টিতে কি হয়ে পুনর্জন্ম গ্রহণ করবেন— নিরয়কুলে, প্রাণীকুলে, প্রেতলোকে, অশুরকুলে, মনুষ্যকুলে, ইন্দ্রিয়পরায়ণ দেবকুলে, রূপব্রহ্মলোকে বা অরূপব্রহ্মলোকে?

এ সমস্ত সম্ভাব্য পুনর্জন্মের প্রতিটি স্তর স্ব-স্ব কর্মফলের উপর স্মৃতিপ্রাপ্ত কিংবা দুর্গতিপ্রাপ্ত হয়। যেই অবস্থা বাঞ্ছনীয় বা সন্তোষজনক ইহাকে বলা হয় স্মৃতি, আর যেই অবস্থা এর বিপরীত ইহাকে দুর্গতি বলা হয়। কিন্তু ইহা বুদ্ধদেশিত মতবাদ নয়। বুদ্ধ বলেছেন— জন্ম পুনঃপুনঃ দুঃখ ব্যাধীত আর কিছুই না।

জন্মই দুঃখ। একজন লক্ষপতি ও একজন ভিক্ষকের মধ্যে দুঃখের তারতম্য রয়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা উভয়ের বেলায় দুঃখ। দুর্গতি-লোকে জন্মগ্রহণ দুর্গতিলোকের এবং স্মৃতিলোকের জন্মগ্রহণ স্মৃতিলোকের জন্ম দুঃখ আনয়ন করে। জন্মকে সম্পূর্ণরূপে রোধ করা চাই। আশ্চর্য হয়ে ভাববেন না যে আপনি পুনর্জন্ম লাভ করবে কি মানুষ হয়ে— কি দেবতা হয়ে কিংবা ব্রহ্ম হয়ে! মানুষ হয়ে পুনর্জন্ম লাভ করলে মানুষের দুঃখ, দেবতা হয়ে জন্ম লাভ করে দেবতার এবং ব্রহ্ম হয়ে জন্ম লাভ করে ব্রহ্মের দুঃখ ভোগ করতে হয়। তা'হলে প্রশ্ন দাঁড়ায় ব্রহ্মদেরও দুঃখভোগ করতে হয়? উত্তরে হাঁ, তাঁদেরও দুঃখভোগ আছে। যদি ব্রহ্ম হয়ে জন্মগ্রহণ করলে দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব হতো, তা'হলে বৌদ্ধধর্মের কোন প্রয়োজন ছিল না। আর্ধ্য তৈয়ার করার নিমিত্তে বৌদ্ধধর্ম এসেছে—

যেখানে মানুষ বলুন, দেবতা বলুন কিংবা ব্রহ্ম বলুন সবার এবং সকল প্রকার দুঃখের অবসান ঘটেছে। এ'জন্ম বুদ্ধকে বলা হয় 'দেবমনুজগণের শাস্তা' যিনি উদাত্ত কণ্ঠে সবার দুঃখের আসান ঘোষণা করেছিলেন।

এখানে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন যে কোন ব্যক্তি এ বিশাল সংসার চক্রের বিশেষ কোন লোকে পুনর্জন্মগ্রহণ করতে পারেন। যেমনঃ নিম্নভূমি বা দুর্গতিলোকে নিরয়জীব, প্রাণী, পেত বা অস্তুরহিসেবে; মধ্যলোকে মানুষ হিসেবে বা উচ্চলোকে ইন্দ্রিয়জ ক্ষেত্রের দেবতা হিসেবে, রূপব্রহ্ম হিসেবে কিংবা, সর্বোচ্চলোকে অরূপব্রহ্ম হিসেবে জন্মগ্রহণ করতে পারে। তাই সেখানে রয়েছে আট প্রকার সম্ভাব্য লোক। এর মধ্যে চারটি দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত রাজ্য বা নিম্ন লোক, একটি মনুজভূমি বা মধ্যলোক এবং অপর তিনটি স্বর্গ বা উচ্চ লোক। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এ আট প্রকার লোকের প্রত্যেকটাতে জন্ম গ্রহণ করাই দুঃখ। যিনি যেই লোকে জন্মগ্রহণ করেন তিনি সেই লোকেই দুঃখভোগ করে থাকেন এবং আমরা প্রত্যেকেই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এ আট প্রকার লোকের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকি। চলুন আমরা এর কারণটা বুঝতে চেষ্টা করি। আমরা প্রথমে দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত রাজ্যে নিরয়-জীব, প্রাণী, পেত বা অস্তুর হিসেবে জন্মগ্রহণের কথা আলোচনা করব।

নরকের সঠিক অর্থ হচ্ছে উৎকর্ষ। ( আক্ষরিক মানসিক সম্ভ্রাস )। উৎকর্ষ 'আপনাকে' অগ্নির মত দগ্ধ করে। যদি আপনি উৎকর্ষায় দগ্ধ হয়ে উত্তেজিত হন, তবে আপনাকে নিরয়-জীব ধরে নেয়া যায়। ভিক্ষু, শিক্ষানবিশ, মুঠে, গৃহকর্তা তিনি যাই হউন না কেন, তিনি যদি মানসিক সম্ভ্রমে প্রজ্জ্বলিত হন, 'আমি' 'আমার' বিপত্তিতে জড়িত হয়ে প্রজ্জ্বলিত হন, তবে মনে করতে হবে তিনি নিরয়ভোগ করছেন। (নরকে বাস করছেন)

যদি কোন মহুর্তে কোন ব্যক্তি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন সেই মহুর্তে সেই ব্যক্তি বোবা প্রাণীতে পরিণত হয়। একজন পুরুষ বা স্ত্রী, ভিক্ষু বা মুঠে যাই হউন না কেন এবং যেই মহুর্তেই তিনি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েন তিনি সেই মহুর্তেই প্রাণীকূলে জন্মগ্রহণ করে থাকেন। প্রাণী হিসেবে 'জন্ম' শব্দের অর্থ এখানে মোহকে বুঝায়।

যেই মহুর্তে 'আমি' 'আমার' বিপত্তি মানসিক ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় পর্যবসিত হয়। যেমন ধরুন জনৈক জুয়াটে বা জনৈক ব্যক্তি লটারীর



টিকেট ক্রয় করে টাকার জন্ম লালারিত হন, পুরস্কার লাভের জন্ম এ ক্ষুধা মানসিক ক্ষুধা ছাড়া কিছুই না— এ'রকম জন্মই ক্ষুধার্ত প্রেত হয়ে জন্মগ্রহণ করা। প্রেত হিসেবে জন্ম হচ্ছে চূড়ান্ত মানসিক ক্ষুধা।

যেখানেই ভয়, ভীকৃত্য সেখানে অশ্বর (ঐহু ভূত) হিসেবে জন্ম বুঝায়। 'অ-শ্বর' শব্দের অর্থ হচ্ছে সাহসী নয় এমন; তাই কোন ভীকৃত্য, ভীতু লোকই অশ্বর।

প্রত্যহ আমরা চারিলোকের সব ক'টি লোকে জন্মগ্রহণ করতে পারি। লক্ষ্য করুন! দেখুন 'আমি' ও 'আমার' বিপত্তি কোন্ পর্যায়ে উৎপন্ন হচ্ছে। যদি এরা উৎকর্ষারূপে উৎপন্ন হয় তবে আপনি নিরবাসী জীব হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। মোহরূপে প্রাণী, মানসিক ক্ষুধা রূপে প্রেত এবং ভীতিরূপে অশ্বর হিসেবে জন্মগ্রহণ করে থাকে। এখানে একটা উদাহরণ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হল।

জনৈক জুয়াটে ভুলবশতঃ সবকিছু হারিয়ে উৎকর্ষিত হন যেন তিনি অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত হয়ে জুয়ার আড্ডাখানায় ঠিক নিরয়ে পতিত হলেন। আবার যখন তিনি মোহগ্রস্ত হয়ে ভাবতে লাগলেন যে এক মাত্র জুয়াই তার সকল সমস্যা সমাধান করতে পারে। একরূপে জুয়াখেলা শুরু করার পূর্বে তিনি বোঝা প্রাণীতে পরিণত হলেন। অ'র খেলার সময় যেই তার অদম্য মানসিক ক্ষুধা উৎপন্ন হল সেই তিনি প্রেত হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। পরক্ষণে যেই তিনি পরাজিত ও হেয়ে যাওয়ার ভয়ে ভীত হলেন সেই তিনি অশ্বর হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। এ হচ্ছে একজন জুয়াটের জুয়ার আড্ডাখানায় চারিলোকে জন্মগ্রহণ করার একটা ক্ষুদ্র উদাহরণ।

আমাদের পিতামহ-পিতামহীগণ ছিলেন বিজ্ঞ। তাই তাদের বলতে শুনছি “স্বর্গ মানুষের অন্তরে; আর নরক মানুষের মনে।” আমরা যারা তাদের ছেলেমেয়ে ও নাতি-নাতনী তারা আপাততঃ দৃষ্টিতে বোকা, কারুণ্য আমরা ভাবি যত্নের পর কেহ স্বর্গে যাবো আর কেহবা নরকে। এ ধারণা কতটুকু বোকামি তা পরীক্ষা করে দেখুন। তাই আমাদেরকে আমাদের পিতামহ-পিতামহীগণদের মত বুদ্ধিমান হতে হবে এবং কমপক্ষে স্বর্গ ও নরক যে মানুষের মনেই অবস্থান করছে তা উপলব্ধি করতে হবে।

ঐ জুয়াটের উদাহরণ ভেবে দেখুন; যিনি ইতিমধ্যে নিরয়-জীব, প্রাণী, প্রেত ও অশ্বর রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। উৎকর্ষার উৎপত্তি ভুলকর্ম বা কর্মফল থেকে।

উৎকণ্ঠাই নরক। মোহ মাঝে মাঝে এমন ধারাপ রূপ ধারণ করে যে যা অবিখ্যাত। এ সম্পর্কে ভালভাবে ভেবে দেখুন; ইহা পরীক্ষা করে দেখুন এবং আপনি দেখতে পাবেন আমরা কিভাবে মাঝে মাঝে অবিখ্যাতরূপে মোহগ্রস্ত হই। এ মোহ আমাদের অগ্নায় ও কুপথে পরিচালিত করে। এবার ক্ষুধার কথাই আসি। অনন্দলাভের জন্ত আকাঙ্ক্ষা, খ্যাতিলাভের জন্ত কামনা, এভাবে সর্বত্রই ক্ষুধা নিয়তই উপস্থিত। আর এ ক্ষুধা যখন মানসিক তৃষ্ণার রূপ লাভ করে তখন আপনি প্রেত হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন। কেন ক্ষুধার্ত হবেন? আমাদের এ ব্যাপারে কি করতে হবে তার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। তাই চলুন, আমরা এ প্রেতরূপ-ক্ষুধা বিহীন কর্ম পরিতৃপ্তি নিয়ে সমাপন করি। এমনকি যদি আমরা লটারী ক্রয় করতে যাই তবে আমরা এ প্রেতরূপ ক্ষুধার বশবর্তী হব না। আমরা টিকেট ক্রয় করব কেবল মাত্র কোতূকের জন্ত অথবা, আমরা ভাবতে পারি এ টিকেটের টাকা দিয়ে আমরা দেশের উন্নয়ন সাধন করব। প্রেত-ক্ষুধা নিয়ে আমরা টিকেট ক্রয় করতে পারব না। সতর্কতা অবলম্বন করলে ‘আমি’ ‘আমার’ বিপত্তি উৎপন্ন হতে পারে না যেমনটি পারেনা প্রেত-ক্ষুধা। কিন্তু যদি সতর্কতার অভাব ঘটে তৎক্ষণাৎ প্রেতক্ষুধা জন্মে। ভয়ের বেলার ও তাই। ভয় অভ্যাसे পরিত্রা হতে পারে। এ সম্পর্কে ভাবুন। কতিপয় লোকের গায় কেঁচো, টিকটিকি ও ইঁদুরকে দেখে ভীত হতে নেই। এটা অসমর্থিত ভয়। এ ভয় থেকে আপনি দৈত্যদের ভয়ে ভীত হতে থাকেন। একরূপ কতিপয় লোক ধর্মভীরু আছেন। তারা ভীত যে ধর্মহীন। জীবনকে স্বাদহীন বিশুক করবে যেমনটা নির্দ্বিগ্ন স্বাদহীন বিশুক। তাই তারা ধর্ম এবং নির্বাণ উভয়কে ভয় করে। এ ধরনের লোক সম্পূর্ণরূপে অসুস্থ।

চলুন এখন আমরা মানবক্ষেত্রে পদার্পণ করি। মূলগ্রন্থে ‘মানব’ সংজ্ঞাটি অবসাদ, ক্রান্তি, বর্ম নিঃসরণ, কঠোর কর্ম নির্দেশ করে; খাপ্ত ও ঐন্দ্রিয়িক আনন্দের জন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলা বুঝায়। এতে উৎকণ্ঠা আছে, আছে মোহ। ইহা কারণ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সং পরিশ্রমের বিনিময়ে কাম্য ফসল। এ হচ্ছে ‘মানব’ এর সংজ্ঞা। ইহাকে কখনো নিরয়-জীব, প্রাণী, প্রেত এবং অসুস্থ হিসেবে চিন্তা করতে নেই কারণ, এ চারিপ্রকার লোক নিকটতর। নরক শব্দের অর্থ উৎকণ্ঠা, প্রাণী অর্থ মোহ, প্রেত অর্থ ক্ষুধা এবং অসুস্থ অর্থ ভয়। আর ‘মনুষ্য’ বা ‘মানব’ অর্থ এর সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি সত্তা।

ইহা দ্বারা সাধারণতঃ চেষ্টা, অধ্যবসায়, কার ও সং ও স্বন্দর সাধনার পর প্রাপ্তি, কার ও পরিশ্রমলব্ধ অর্থের দ্বারা ক্রয় ব্যয়। এরই সমন্বয়ে একটা সন্তাই মানুষ। সংক্ষেপে ‘মানব’ অর্থ হচ্ছে শারীরিক অবসাদ, একটি অভ্যাসগত অবসাদ ও অবস্থা।

এর চেয়ে উচ্চতর স্তরে অবস্থিত কামাবচর (কামুক) স্বর্গ। যাদের স্বর্গপুরী ও অপসরী পরিচারিকা রয়েছে আমরা এসব দেব-দেবীর কথা শুনে থাকি। এ স্বর্গে শারীরিক অবসাদ নেই; রয়েছে কামুক আনন্দের প্রাচুর্যতা।

এর চেয়ে উচ্চতর স্তরে অবস্থিত রূপব্রজ যেখানে দেব-দেবীরা কামুক আনন্দে অবসর - দূষিত কামুক আনন্দ পরিহার করে বিশুদ্ধ কামুক পরিবেশ কামনা করে-যারা বস্তুজগতের সাথে সম্পৃক্ত। এরচেয়ে উচ্চতর স্তরে অবস্থিত অরূপব্রজ যাদের শরীর ক্ষণস্থায়ী—কোনকিছুর সাথে সম্পৃক্ত থাকার টেকসই নয়—অশরীরি অনুভব করাটাই উত্তম মনে করে থাকে।

এ সংজ্ঞাগুলোর অর্থ প্রাত্যহিক রীতিতে পড়ে না। উদাহরণস্বরূপ, এক প্রকাণ্ড তাম্রপাত্রস্থিত ফুটন্ত তরল পদার্থ ও এসিড সাগর চিত্রিত, তলেলায় ও বর্ষা বর্ষণ সমন্বিত প্রাচীরবৎ নরক একটা রূপক দ্বারা মানসিক অবস্থার বস্তুগত সংজ্ঞা নিরূপণ করা যায় না। ইহা উৎকর্ষ ও মানসিক সন্তোষের শারীরিক ব্যাখ্যা। তরুণ আমাদের রয়েছে মোহ, ক্ষুধা এবং ভীতির শারীরিক অবস্থা। আবার মনুষ্যালোক হচ্ছে অবসাদময়। এবং কামাবচর স্বর্গ হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে ঐন্দ্রিয়িক পরিতৃপ্তি।

অরূপব্রজগণ কামুক আনন্দে সম্পৃক্তহীন—বিশুদ্ধ বস্তুসমূহের আনন্দ লাভ করে থাকে।

## চিত্ত থেকে সাবধান হউন

চলুন আমরা নিজদের মনের অবস্থা পরীক্ষা করে দেখি। কখনো কখনো আমরা ঐন্দ্রিয়িক আনন্দে নির্বোধ। কিন্তু আমরা যখন উহা বারবার আনন্দন করি আমাদের অবসাদ ও বিরক্তি উৎপন্ন হয় এবং তা থেকে বিরতি ও বিশ্রাম নেয়ার কথা ভাবি। কখনো আমরা খেলাধুলা করতে চাই—কখনো বা বস্তুজগতের সাথে আমোদে মেতে উঠি। আর যখন আমাদের সন্তুষ্ট করতে পারেনা তখন আমরা যশ ও খ্যাতি, সৌভাগ্য ইত্যাদি মানসিক বস্তুর কথা চিন্তা করি।

এমন ও লোক আছেন যারা ঐন্দ্রিয়িক আনন্দবোধে নির্বোধ। পাশাপাশি কতকগুলো লোক বাগান করা, মাছ ও পায়রা পোষা এবং এসব সখের সাথে আমোদে মাতিয়ে থাকা অধিকতর পছন্দ করেন। চিত্ত এভাবে প্রল্লিখিত হতে বাধ্য। কিন্তু ইত্যাবসরে জনৈক ব্যক্তি এরূপ ভেবে দেখেছেন যে এসব বস্তুই মতসব বিশৃঙ্খলার উৎস যা কখনো সৌভাগ্য, সৌন্দর্য, যশ ও

খ্যাতির মত মানসিক বস্তুর সাথে তুলনা করা যায় না। নিজকে পরীক্ষা করে দেখুন যে চিত্ত কত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে।

জনৈক ব্যক্তি দৈনিক এক ঘণ্টাকাল কামুক আনন্দে মেতে থাকতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তারপর তিনি তৎপরিবর্তে নিজেকে খেলাধুলা বা আমোদজনিত কোন সখে মাতিয়ে রাখতে চান। এর পর তিনি কাম, খেলাধুলা ও আমোদ প্রভৃতি থেকে অব্যাহতি পেতে চান। এরই মাঝে কখনো তিনি দীর্ঘক্ষণ কর্ম করে ক্লান্ত হয়ে ‘মানব’ হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। এবং কখনো বা তিনি উৎকর্ষা ভোগ করেন নিরয়ের মত; মোহগ্রস্ত হয়ে প্রাণী; ক্ষুধার্ত হয়ে প্রেত কিংবা ভীত হয়ে অস্ত্ররহ লাভ করেন। তাই জনৈক ব্যক্তি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিচিত্র লোকে জন্ম গ্রহণ করে থাকেন; এবং সপ্তাহকালের মধ্যে তিনি অষ্টলোক জন্ম অভিজ্ঞতা লাভ করেন। মানবকুলে জন্ম গ্রহণ করেও তিনি চারিপ্রকার দুঃখজনক লোকের যে কোন একটাতে অবস্থান করতে পারেন কিংবা দেবলোক এবং স্বর্গলোকেও জন্মগ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু ইহা যে ধরনের জন্মই হউক না কেন জন্ম দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নহে। দুঃখ থেকে মুক্তি বলতে জন্ম থেকে মুক্তি বুঝায়। এই শেষ বিষয়টিটা বুঝে উঠা কঠিন। কিন্তু যেই একবার আপনি তা বুঝতে সক্ষম হলেন আপনি বুকের সমুদয় শিক্ষা বুঝতে সক্ষম হবেন।

‘জন্ম থেকে মুক্তি’ অর্থ এই নয় যে শারীরিক দেহাবসান এর পর পুনরায় জন্ম গ্রহণ না করা। বরং ‘জন্ম থেকে মুক্তি’ অর্থ ‘আমি’ ও ‘আমার’ আত্মধারণা, অহমিকা ইত্যাদি উৎপত্তি রোধ করাকেই বুঝায়। কোন কাজের পূর্বে বিপত্তিরোধ জনিত সতর্কতাই যথেষ্ট। এমতাবস্থায় ‘আমি’ ও ‘আমার’ ব্যতীত কোন কাজ সম্পন্ন করাই যথোপযুক্ত তথা আনন্দদায়ক। এ হচ্ছে বুদ্ধ শিক্ষা নীতির সার নির্যাস। ইহা আমাদিগকে ‘আমি’ ‘আমার’ বিপত্তি মুক্ত চিত্ত নিয়ে কাল যাপন করার কথা শিক্ষা দেয়। প্রত্যেক ধর্মই একরূপ শিক্ষা দেয়। ইহা প্রকৃতি আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত; ইহা নিখুঁত ও বিজ্ঞানসম্মত।

বৌদ্ধবাদ এ শিক্ষা দেয় যে, যদি কারও চিন্তাধারা আত্মধারণা প্রসূত, আত্মবেষ্টিত হয় তবে ইহা দুঃখ। খ্রীষ্টানবাদও শিক্ষা দেয় যে ‘আমি’ বা ‘আমার’ বিপত্তি চিন্তা না করা এবং ‘আমি’ বা, ‘আমার’ বিপত্তিকে ভুলভাবে অবহিত না করা। কিন্তু অধিকাংশ খ্রীষ্টান এ শিক্ষা বুঝে না যেমন বুঝে না অধিকাংশ বৌদ্ধ। বড়ই পরিভ্রান্তের বিষয় যে এ শিক্ষা বিশ্বধর্মবাদ হয়ে ও স্ব স্ব ধর্মের জোবেলা এ বাস্তব নীতিকে কেহ গ্রহণ করতে চায় না। “জন্ম হল কর না! জন্ম রোধ কর!”—আমরা

বৌদ্ধরা এর অর্থ বুঝি না এবং বুঝতে চাই না বলে আমরা এতে হতভম্ব হয়ে পড়ি, ইহা অবিশ্বাস করি এমন কি এ শিক্ষাকে মিথ্যে নীতি বলে উড়িয়ে দিই। সম্ভবতঃ আমরা এ মতবাদ মিথ্যে বলে বুদ্ধকে সরাসরি দোষী সাব্যস্ত করতে যাই না তবে এ ধারণা আমরা প্রায়ই আমাদের চিন্তে পোষণ করি অথবা, আমরা ভাবতে পারি কোন কোন ভিক্ষু বুদ্ধের এ মতবাদকে মিথ্যে ব্যাখ্যার সাহায্যে প্রকাশ করেছে। তাই আমরা সম্পূর্ণরূপে ‘আমি’ বা ‘আমার’ বিপত্তি রহিত অনাত্মা মতবাদ ও মানসিক শূণ্যতা মতবাদকে বুঝে উঠতে অক্ষম। ফলে আমরা দুঃখ অভিজ্ঞান লাভ করি। আমরা ঘন ঘন পুনর্জন্ম গ্রহণ করি; আমরা নির্বাণ নয় সংসার চক্রেই অভিজ্ঞান লাভ করি বেশী।

এর প্রমাণস্বরূপ দেখতে পাই হাসপাতালগুলো স্নায়ু ও মানসিক ব্যাধি সম্পন্ন রোগীতে ভর্তি। এ মানসিক ব্যাধি রোধ করার জন্ত আসল সত্যটা কোন লোক অনুধাবন করতে চায় না। এটাই বুদ্ধ শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য। বুদ্ধের শিক্ষানীতির চরম সীমা ছিল মানসিক সতর্কতায়, অবিরাম সতর্কতায়, জগৎকে ‘আমি’ ‘আমার’ বিপত্তি শূণ্যতার মধ্যে দেখা, চিন্তকে সর্বদা ‘আমি’ ‘আমার’ বিপত্তিমুক্ত রাখা। শূণ্য সতর্কতা অবলম্বন করলে আপনি জানতে পারবেন আপনাকে কি করতে হবে। এ হচ্ছে বুদ্ধ শিক্ষা নীতির প্রধান উদ্দেশ্য।

## আত্মবিমুক্তি

আত্মবিমুক্তি নিয়ে খ্রীষ্টানদের রুচিহীনতা সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে। ইহা কর্নেলিয়াসদের গ্রন্থ থেকে নেয়া নূতন বাইবেলের একটা অংশ যেখানে সেন্টপল যীশুর সমস্ত শিক্ষাকে সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছেন।

কর্নেলিয়াসদের উদ্দেশ্যে বর্ণিত এ অংশে উল্লেখ আছে যে “আপনার জী আছে কিন্তু মনে করতে হবে আপনার জী নেই—আপনার ধন আছে, মনে করতে হবে আপনার তা নেই—আপনার দুঃখ আছে, মনে করতে হবে আপনার তা নেই—যদি আপনি স্তম্ভী হন, তবে মনে করতে হবে আপনি তা নন—যদি আপনি বাজার থেকে মালপত্র ক্রয় করেন, মনে করতে হবে তার কিছুই বাড়ীতে আনেন নি।”

এখানে আমরা বাইবেলে বুদ্ধ শিক্ষা নীতির সত্তা উপলব্ধি করছি। যেমন :—“আপনার জী আছে, মনে করুন আপনার তা নেই।” মানুষের কাছে গল্পের বস্তু। এই নয় যে যে স্তম্ভীর স্বামী আছে তার মনে করতে হবে যে তিনি স্বামীহীন। কিন্তু এ বস্তু স্বামী এবং জী উভয়ের বেলায় মঙ্গল।

অর্থটা হচ্ছে—আকর্ষিত হইয়া, অনুসরণ করোনা; আমার বিপত্তিকে চিহ্নিত করোনা। ” আপনার সম্পদ রয়েছে বলে তাকে অনুসরণ করবেন না। এবং ভাববেন না যে এ সম্পদ আপনারই। বরং ভাবুন আপনি সম্পদবিহীন। যদি দুঃখের উৎপত্তি ঘটে তখন ইহার প্রাপ্তি স্বীকার করুন এবং দেখবেন ইহার অবসান ঘটেছে। ভাববেন না যে ইহা আপনারই দুঃখ। যদি সুখ আসে তবে মনে করবেন না যে ইহা আপনারই সুখ। যদি বাজারে গিয়ে কিছু ক্রয় করেন তবে মনে করবেন যেন বাড়ীতে কিছুই আমেননি। এর অর্থ হলঃ যখন আমরা ক্রীত বস্তু বহন করে বাজার থেকে বাড়ী নিয়ে আসি আমাদের মন যাতে ইহা ‘আমার’ তা চিহ্নিত করতে না পারে। এই অর্থে আমরা বাড়ীতে কিছুই আনয়ন করিনি। এটা হচ্ছে খৃষ্টিয়ানদের মূল শিক্ষানীতি।

একদা আমি জনৈক উচ্চপদস্থ খৃষ্টান শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তিনি কিভাবে এ শিক্ষানীতি বুঝতে পেরেছিলেন। প্রথমে তিনি নির্বাক ছিলেন। পরে তিনি বললেন যে এতে তাঁর আদৌ রুচিবোধ নেই। বাইবেলের এ অংশে যাই লিপিবদ্ধ থাকুক না কেন তিনি সেটাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করার দরুণ এতে তার রুচিবোধ ছিল না। বিশ্বাস বিষয়টির প্রতি তাঁর বড় রুচিবোধ ছিল কিন্তু ওই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়টিতে তা তাঁর ছিল না। প্রত্যেক ধর্মেরই একই উদ্দেশ্য আত্মকেল্লিকতা থেকে বিমুক্তি শিক্ষা। খৃষ্টানধর্মের এ শিক্ষাও আমাদের বৌদ্ধধর্মের মত। বৌদ্ধদের মত এদেরও মানসিক শূন্যতা ও অনাত্ম মতবাদে রুচিবোধ নেই।

অতএব, ইহা বলা যেতে পারে যে মানবজাতি তার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়ে আত্মাহীন। জনগণ কেবলই ‘আমি’ ও আমার বিপত্তিবর্ধক খোসগল্প ভোজন ও আত্মকেল্লিক আমোদ-প্রমোদে কোতুহলী। ফলে তারা নিরায়-জীব, প্রাণী, প্রেত ও অস্তুর হয়ে নিয়তই জন্মগ্রহণ করে থাকে। যদিও বা মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে তাদের আমিষ হ্রাসের কোন প্রচেষ্টাই থাকে না। কখনো বা যদি তারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয় তারা দেব-ব্রহ্ম অনুরূপ দুঃখজ্ঞান লাভ করে। তারা এর কারণ বুঝতে পারে বলেই বরং তারা মায়ের (শয়তান) প্রভাবে পড়ে বুদ্ধের অধ্যাত্মবাদে পড়ে না।

মার (শয়তান) এমন একটা বিষয় যা আমরা সঠিকভাবে বুঝি না। বাস্তবে ‘মার’ এমন কতকগুলো লোভনীয় বস্তুকে নির্দেশ করে যা মনকে আকর্ষণ ও বশীভূত করে। ইহা বিশেষতঃ কামজ ও ঐন্দ্রিয়িক আনন্দ নির্দেশ করে। মার সেনাপতি আমাদের পক্ষ নিম্নিত বশবর্তী স্বর্গে প্রলুব্ধ করে। এহেন ঐন্দ্রিয়িক আনন্দে পরিপূর্ণ স্বর্গে বাহিরে বসবাসকারী মারেরা আপনার প্রয়োজনে পরিচর্যা করে, দেখাশুনা ও সেবা-শুশ্রূষা করে। ইহারা মারের সেনাপতি নামে পরিচিত।

আমরা এ সকল বস্তু কামনা করছি বলে এবং আমরা এতদ্বারা চিন্তে 'আমি' ও 'আমার' বিপত্তি কর্ষণ করছি বলে আমরা এ মুহূর্তে মারের শিকার হয়েছি। একদা 'আমি' ও 'আমার' বিপত্তি উৎপন্ন হয়েছে এবং যা এখনও বিদ্যমান, এ অবস্থায় আমরা মারপ্রাপ্তিতে পতিত হয়ে থাকি বুদ্ধ-ভাবাপন্নপ্রাপ্তিতে নয়। যখনইবা চিন্তে 'আমি' ও 'আমার' বিপত্তিগত ধারণা জন্মে তখনই মার উপস্থিত হয় এবং সেই আপনি মারের শিকার হলেন। আর যখন চিন্তে 'আমি', 'আমার' বিপত্তিশূন্য হয় তখন আপনি বুদ্ধভাবাপন্ন বা অনুসারী হলেন।

মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আপনি কয়েক মুহূর্তের জ্ঞান মারের শিকার এবং কয়েক মুহূর্তের জ্ঞান বুদ্ধভাবাপন্ন বা অনুসারী হতে পারেন। প্রত্যেকেই ইহা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে বলে এখানে আমরা তা ব্যাপক আলোচনা করছি না। প্রত্যেকেই দেখতে পাবেন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র কয়েক মুহূর্তের জ্ঞান তার চিন্তে 'আমি' ও 'আমার' বিপত্তি উদয় হচ্ছে আবার তা কয়েক মুহূর্তের জ্ঞান বিলয় হচ্ছে। যে মুহূর্তের 'আমি' ও 'আমার' বিপত্তি উৎপন্ন হল সে মুহূর্তে আপনি জন্মগ্রহণ করলেন এবং এ বিপত্তিকে আপনি সনাক্ত করতে পারছেন বলেই আপনি নিয়তই দুঃখ ভোগ করে থাকেন। সমাক্তকরণকে আমরা এড়িয়ে চলব এবং 'আমি' ও 'আমার' বিপত্তি উৎপত্তি রোধ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করব। আমাদিগকে মানসিক শূন্যতা, নীরবতা বা নির্বাণকে প্রতিপালন ও বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে আমরা যথাসময়ে শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা মুক্ত হতে পারি।

বহুমূরোগ, উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগ প্রভৃতি 'আমি' ও 'আমার' বিপত্তি থেকে সৃষ্ট। 'আমি' ও 'আমার' সনাক্তকরণই যতসব বিরক্তির উৎস যা আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ বিশ্রাম রোধ করে। যেই চিন্তা বৈকল্য ঘটে সেই শরীরের চিনি বিপাক অস্বাভাবিকরূপে জট উঠা-নামা করে আর শারীরিক অসুস্থতার কারণ ঘটে। মানসিক ব্যাধি মানসিক দুঃখেরই নামান্তর। সংক্ষেপে, আমাদের শরীর এ মানসিক দুঃখের জোর সহ্য করতে পারে না বলে কারণ হয় স্নায়বিক বা মানসিক অসুস্থতা এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত। যদিও আপনি মৃত্যু থেকে অব্যাহতি পান মনে হবে অত্যধিক দুঃখ বিষাদ যেন আপনাকে নরকে নিষ্কিন্ত করল। আমরা নরককে উৎকর্ষার সমান প্রতীয়মান করেছি যদিও মূল গ্রন্থাংশে অষ্টবিংশতি বা তার চেয়েও বেশী নিরয়ভূমি রয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরিশেষে, যাই হোক, সকলভূমিই উত্তাপ দুঃখভোগ করে থাকে। প্রেতের বেলায় ও একই কথা। কয়েক প্রকার প্রেতের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তৎমধ্যে সর্পপ্রেত যার মুখাকৃতি সূচালো কিন্তু পেটের আকার পর্বতপ্রমাণ (যাদের ক্ষুধা কখনও নিবৃত্ত হয় না)। অত্যাশ্রু প্রেতের বেলায়ও ক্ষুধা একই ব্যাপার।

নিরন্ন-জীব উৎকর্ষা ভোগ করে, প্রাণীকুল মোহগ্রস্ত থাকে, প্রেতরা থাকে ক্ষুধার্ত, অস্বরূপ ভীত, মনুষ্যগণ অবসন্ন, কামাবচর দেবতাগণ ঐন্দ্রিয়িক আনন্দে নির্বোধ বা কামান্ধ, রূপব্রহ্মগণ বিশুদ্ধ শারীরিক বস্তুসমূহে নির্বোধ এবং অরূপব্রহ্মগণ মানসিক বস্তুসমূহ দ্বারা নির্বোধ থাকেন। এই গেল সকল প্রকার জন্ম কাহিনী। কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া যেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন প্রত্যেককে অবশ্যই দুঃখ ভোগ করতে হবে। তাই এ জন্মকে সম্পূর্ণ-রূপে রোধ করা চাই। ‘অহমিকা’ বিপত্তি ত্যাগের মাঝেই পরম সুখ। সতর্কতা ও অন্তর্দৃষ্টি ধারণ করুন। ‘আমি’ ও ‘আমার’ বিপত্তি মুক্ত হউন, আপনি দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করবেন। যদি এ অবস্থা ধারণের মধ্যে স্থায়ীত্বতা আসে তবে সঠিক ও সম্পূর্ণ নির্বাণ।

## পরিশ্রম সহকারে চেষ্টা করুন

আমরা ইতিমধ্যে ক্ষনিক নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছি। চলুন, আমরা একে দীর্ঘায়িত করি, যতদূর সম্ভব দুঃখ বা সংসার চক্রকে হ্রাস করে। আমাদের দীর্ঘ আশি বৎসর বা, শত বৎসরের জীবনের মাঝে এ সুযোগ নষ্ট করা উচিত নয়। যদি আমরা এর উন্নতি সাধন করতে না পারি এমন কি হাজার বছর পরও আমরা এ সুযোগ কোথাও নাও পেতে পারি। কিন্তু যদি আমরা এর উন্নতিবিধান করি আমরা ইহজীনে সম্পূর্ণ নির্বাণ লাভও করতে পারি। তিনি একজন শিশু, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, প্রাপ্ত বয়স্ক অশীতিপর বৃদ্ধ বাই হউন না কেন কেহ যদি এর অর্থ সঠিকভাবে বুঝতে পারেন যে কিতাবে দুঃখের উৎপত্তি ঘটে এবং কিতাবে ইহার অবসান ঘটে তিনিই কার্যকরভাবে তার সকল অসুস্থতা থেকে আরোগ্যলাভ করবেন; ‘আমি’ ও ‘আমার’ বিপত্তিজনিত আত্মকেন্দ্রিকতা দমন করতে পারবেন; এমন কি তিনি স্বয়ং এর প্রতি বিরক্তিবোধ করবেন এবং দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করে শীতলতা, সুখ স্ত্রান লাভ করবেন। ভগবান বুদ্ধ সাক্ষেপে ব্যক্ত করেছেন; কোন কিছুই প্রতি লোভ করেনা বা অনুসরণ কর না কোন কিছুকে (সর্বৈ ধর্ম নলম অভিনিবেসর) এর অর্থ হচ্ছে ‘আমি’ ও ‘আমার’ বিপত্তিকে অনুসরণ করো না অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই ‘আমি’ ও ‘আমার’ বিপত্তিকে ভাবতে নেই। যে ব্যক্তি সাহসিকতার সাথে এরূপ ভাবেন সে চোর। চৌর্যবৃত্তিতে কোন মঙ্গল লাভ হয় না; ইহা ঐ চোরকে দুঃখে পরিচালিত করতে বাধ্য। তাই বুদ্ধের এ শিক্ষা থেকে আমাদের কোন কিছুই প্রতি ‘আমি’ ও ‘আমার’ বিপত্তি নিয়ে অনুসরণ করা উচিত হবে না। বুদ্ধের এ গূঢ় অথচ উদাস্ত বাণী বুঝে উঠা যেমন কঠিন তেমনি গ্রহন করা কঠিনতর যে কেহও যদি সম্যক জীবন অনুশীলন করেন তবে পৃথিবী অহং শূন্য হতে পারে না। ইহা বুদ্ধের সমস্ত শিক্ষার সারমর্ম।